গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ২৬ সংখ্যা | ৬ - ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা

কেন্দ্রীয় বাজেট
অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা বুলি

বার্ষিক বাজেট ২০২৬ বক্তৃতার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায়, এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

“আজ অর্থমন্ত্রী ২০২৬ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন, তাতে দেশের বাস্তব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কোনও ছবি প্রত্যাশিত ভাবেই নেই। বরং এটি বিজেপি সরকারের ‘জমকালো’ কর্মক্ষমতার সুন্দর ভাবে তৈরি স্ব-প্রশংসনীয় দলিল যা সন্দেহজনক ভাবে সংকলিত ভুয়ো তথ্যে ভরা।

বাজেটে কোনও নির্দিষ্ট খাতভিত্তিক বরাদ্দ স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়নি, এমনকি পূর্বে ঘোষিত প্রকল্প বা কর্মসূচিগুলোর ওপর গৃহীত পদক্ষেপের প্রতিবেদন বা অগ্রগতির বিষয়েও কোনও উল্লেখ নেই। বাজেট বক্তৃতাটিকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ

চারের পাতায় দেখুন

এসআইআর শুনানির নামে ব্যাপক হয়রানির বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন মানুষ। ছবি ঃ মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া, ৩০ জানুয়ারি

বিচারপতি প্রমাণ করলেন তিনি শ্রেণি-রাজনীতির বাইরে নন

এ কি শুধুই ধান ভানতে শিবের গীত, নাকি মনের কথাটাই বেরিয়ে এল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কথায়? না হলে গৃহসহায়কদের ন্যূনতম বেতন স্থির করে দেওয়ার আর্জি শুনতে গিয়ে হঠাৎ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কত খারাপ তার ফিরিস্তি দিতে শুরু করবেন কেন তিনি? বিচারপতি বলেছেন, দেশে শিল্পের বিকাশ বিঘ্নিত হওয়ার জন্য মূলত দায়ী শ্রমিক সংগঠনগুলিই। তিনি বলেন, শ্রমিক সংগঠনগুলির জন্য দেশের কত শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছে জানেন? গোটা দেশে বিভিন্ন শিল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে এই ‘ঝান্ডা সংগঠনগুলোর’ জন্যই।

প্রধান বিচারপতি যে হঠাৎ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন, তার মানে ধরে নেওয়া যায় দেশে শিল্পের বিকাশ বিঘ্নিত হওয়ার জন্য শ্রমিক সংগঠনগুলিই যে দায়ী এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। কিন্তু তিনি যে হেতু কথাগুলি প্রধান বিচারপতির আসন থেকে বলছেন, তাই শুধু তিনি নিশ্চিত হলেই তো চলে না, তিনি কীসের ভিত্তিতে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সিদ্ধান্তের মতো জানিয়ে দিলেন তা দেশের মানুষেরও জানা দরকার। শ্রমিক সংগঠনগুলির আন্দোলনের জন্য আদৌ কোনও কারখানা বন্ধ হয়েছে কি না, হলে কতগুলি হয়েছে, আর মালিকরা নিজেরা কতগুলি কারখানা বন্ধ করেছে, বড় পুঁজিপতিরা কত সংখ্যায় ছোট পুঁজিপতিদের কারখানা গিলে খেয়েছে, এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য তাঁর কাছে আছে কি? থাকলে তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি হিসাবে তা তুলে ধরলেন না কেন? না হলে কীসের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে বলে দিলেন? নাকি প্রধান বিচারপতির কথাগুলি একেবারেই মনগড়া?

অবশ্য প্রধান বিচারপতির কথাগুলি অদ্ভুত ভাবে মিলে যাচ্ছে এ দেশের মালিক শ্রেণির কথার সঙ্গে। মালিক তথা দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি দীর্ঘ দিন ধরে ঠিক এই কথাগুলিই দেশবাসীর উদ্দেশে প্রচার করে আসছে। এ কথাগুলির সঙ্গে বাস্তবের বা সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। বাস্তবে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনার এক কানাকড়িও মালিকরা দেয় না, প্রধান বিচারপতি যেগুলিকে ‘ঝান্ডা সংগঠন’ বলেছেন সেই ট্রেড ইউনিয়নগুলি সংগঠিত ভাবে আন্দোলন না করলে। অর্থাৎ শ্রমিকরা যে আন্দোলন করে, ধর্মঘট করে তা বাধ্য হয়েই। আশ্চর্যের বিষয়, প্রধান বিচারপতি, যিনি বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে অধিষ্ঠান করছেন, সংবিধান রক্ষার হক নিয়ে বসে আছেন, তিনিই শ্রমিকদের কাছ থেকে সংবিধান তাদের যে অধিকার দিয়েছে সংগঠন করার সেই অধিকারকেই কার্যত নাকচ করে দিলেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

সমীক্ষা না বুজরুকি!

আর্থিক সমীক্ষা

দেশের মানুষের আর্থিক পরিস্থিতি শোচনীয় হওয়ার কারণ খুঁজে পেয়ে গেছেন নরেন্দ্র মোদি সরকারের আর্থিক থিঙ্ক-ট্যাঙ্করা! দেশে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংকট কেন, মানুষের হাতে রোজগার নেই কেন, কেনই বা টাকার দাম নিজেই নিজের সর্বকালীন কম হওয়ার রেকর্ড প্রায় প্রতিদিন ভেঙে ফেলছে? ৩০ জানুয়ারি সংসদে পেশ হওয়া আর্থিক সমীক্ষার রিপোর্টে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং সরকারের প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা একযোগে বলে দিয়েছেন, এ সবে জন্য বিদেশের সংকটই দায়ী! অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা সাধারণত দেশের যত কিছু দুর্দশার দায় আগের সরকারগুলির ওপর চাপিয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেন। এ বার আর্থিক ক্ষেত্রে তাঁরা বিদেশের ধুয়ো ধরেছেন!

এই সমীক্ষা বলেছে বিশ্বের আর্থিক পরিস্থিতি যত খারাপই থাকুক না কেন, দেশের আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল এবং আর্থিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা ৬.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭.২ শতাংশ হতে পারে। যদিও একই সাথে সমীক্ষা বলে দিয়েছে আগামী আর্থিক বছরে দুনিয়ার আর্থিক পরিস্থিতি যদি কিছুটা ভালর দিকেও যায় তা কখনওই পুরোপুরি নিরাপদ অবস্থায় যাবে না। আশ্চর্যের বিষয়, ভারতের আর্থিক পরিস্থিতির প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁরা তিনটি সম্ভাবনার কথা বলে দিয়েছেন। বলেছেন, প্রায় সমান সমান সম্ভাবনা আছে— বিশ্ব পরিস্থিতি একেবারে স্থিতিশীল থাকার, না হয় মাঝারি ধরনের আর্থিক বিপর্যয়, যুদ্ধ, নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদির। আবার একই সাথে বলেছেন, ২০০৮-এর থেকেও খারাপ আর্থিক পরিস্থিতিতে বিশ্ব যেতে পারে, তেমন সম্ভাবনা কম হলেও আছে। প্রশ্নটা হল, এই রকম সব সম্ভাবনা এক নিঃশ্বাসে বলে লোকঠকানো জ্যোতিষীর ভূমিকা নেওয়ার জন্যই কি আর্থিক উপদেষ্টা থেকে শুরু করে অর্থ দফতরের

তিনের পাতায় দেখুন

প্রজাতন্ত্র দিবসে জীবন্ত পুড়লেন প্রজারা

সাতাত্তরতম প্রজাতন্ত্র দিবসের ভোরে রেড রোডে কুচকাওয়াজ চলছে। রাজ্যপাল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে ‘গণতান্ত্রিক’ দেশের সংবিধান কার্যকর হওয়ার বর্ণাঢ্য উদযাপন। সেই সময় কয়েক কিলোমিটার দূরে শহরের আর এক প্রান্তে তালাবন্ধ গুদামঘরে বাঁচার জন্য আর্তনাদ করতে করতে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া দেহ থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে, তারা প্রজা হলেও সরকারের চোখে বোধ হয় ঠিক মানুষ নয়, নিছক ঠিকা ‘শ্রমিক’। দিন ভর খাটনির পর জিনিসপত্রে বোঝাই যে গুদামঘরে তারা শুতে পান, সেখানকার পরিবেশ বা সুরক্ষা কেমন, সেখানে মানুষ শুতে পারে কি না, শ্বাস নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত বাতাস আছে কি না, আগুন লাগলে দ্রুত নেভানো যাবে কি না, এ সব কথা মালিক বা মালিকদের পয়সায় চলা সরকার, কারওরই ভাবার দরকার পড়ে না। তাই আনন্দপুরের নাজিরাবাদ অঞ্চলের দুটি গোডাউনে যখন

দুয়ের পাতায় দেখুন

নাজিরাবাদ অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিক মৃত্যুতে কলকাতায় এআইইউটিইউসি-র বিক্ষোভ মিছিল। ২৯ জানুয়ারি

জীবন্ত পুড়লেন প্রজারা

একের পাতার পর

বিধ্বংসী আগুন লাগল, শ্রমিকরা নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে আগুন আর ধোঁয়ার মাঝে ছটফট করলেন, কেউ প্রিয়জনকে শেষবার ফোন করে বললেন 'খুব কষ্ট পেয়ে মরছি, আর পাঁচ মিনিটের বেশি বাঁচব না', কেউ ভাইকে ফোন করে নিজের স্ত্রী ছেলেমেয়েকে দেখার অনুরোধ করে গেলেন। আর সেই মানুষগুলোর আত্মীয়-পরিজন অপরিসীম আতঙ্ক আর যন্ত্রণা নিয়ে ছুটে গিয়ে দেখলেন, তাদের স্বামী, ভাই, বাবা, ছেলে বন্ধ গুদামের ওপারে জীবন্ত পুড়ছে। গুদামের দরজা তালা বন্ধ, আর এক দরজার মুখ প্রচুর কাঠ-বাঁশ ইত্যাদিতে আটকানো। ফলে দমকলের বারোটি ইঞ্জিন প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা পর যখন আগুন নেভাতে পারল, তখন স্বভাবতই ভস্মীভূত গুদামে পড়ে আছে ছাইয়ের সাথে মিশে থাকা শ্রমিকের হাড়, গলে যাওয়া দেহাংশ যা থেকে মানুষটাকে চিনতে পারা তো দূরের কথা, ডিএনএ পরীক্ষা করে শনাক্ত করাও দুষ্কর। এ পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমে ২৭ জনের মৃত্যুর খবর এলেও নিখোঁজ বাকিরাও যে নিশ্চিতভাবে মৃত, এ কথা বোঝা কঠিন নয়। প্রিয়জনের এই মর্মান্তিক মৃত্যুর পর তার মরদেহ বা দেহাংশ নিতে এসেও চূড়ান্ত হয়রানি আর দুর্ভোগ সইতে হল বাড়ির লোকদের। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় অসহায়ের মতো ছোটাছুটি করতে করতে শোকার্ত মানুষগুলোকে জেরবার হতে হল শুধু খাতায় কলমে স্বজনের মৃত্যু সুনিশ্চিত করার জন্য, যে মৃত্যুর জন্য একমাত্র দায়ী মালিকপক্ষ-সরকার-প্রশাসনের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং অপদার্থতা।

একটি গুদামে যাদের কারখানা চলত, ঘটনার প্রায় তিনদিন পরে সেই 'ওয়াও মোমো' কোম্পানি একটা দায়সারা বিবৃতি দিল, যেখানে তাদের মাত্র তিনজন মৃত কর্মচারীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা আছে। বাজারে এই ওয়াও মোমোর সম্পত্তির পরিমাণ ২৮০০ কোটি টাকা, কিন্তু যে শ্রমিককে নিংড়ে এই লাভের অঙ্ক বেড়ে চলে এবং মালিকেরই অবহেলায় যাকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়, সেই শ্রমিকের লাশের দাম তারা ধার্য করেছে মাত্র দশ লক্ষ টাকা। এবং এ প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় ভেসে গেলেও মালিকের পক্ষে থাকা আইন যে সরব হবে না, এ দেশে শ্রমিকের পরিবার-পরিজন তা জীবন দিয়ে জানেন। তাই দুটি গুদামের মালিক গ্রেপ্তার হলেও মোমো কোম্পানির দু'জন সাধারণ আধিকারিককে ধরা হল। তাও অনেক দেরিতে প্রবল বিক্ষোভের চাপে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে দমকলমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী কারও গলায় এতটুকু অনুতাপ বা শোকের চিহ্ন পাওয়া গেল না। দমকলমন্ত্রী ঘটনাস্থলে পৌঁছালেন ছত্রিশ ঘণ্টা পরে এবং নির্লজ্জের মতো বললেন, এখন আর গিয়ে লাভ কী, শুধু শুধু দমকলের কাজের বিঘ্ন ঘটানো হবে।

মুখ্যমন্ত্রী কথায় কথায় নিজের সরকারকে মা-মাটি-মানুষের সরকার বলে থাকেন, এতগুলো মানুষের মৃত্যু, এতজন মা-বোনের বুক খালি হওয়ার পর তিনি একটিবারও ঘটনাস্থলে গেলেন না এবং শোকপ্রকাশ করে বিবৃতি পর্যন্ত দিলেন না! ক্ষমতার দম্ভে নেতা-মন্ত্রীরা সাধারণ মানুষকে বোকা ভাবতে পারেন, কিন্তু ওয়াও মোমো এবং এই পুষ্পাঞ্জলি ডেকরেটোর্সের মতো অসংখ্য ব্যবসায়ী সংস্থার সাথে সরকারের যে অঘোষিত লেনদেন চলে, এদের পয়সাতেই যে ভোটের আগে বড় বড় দলগুলো পেশিশক্তি প্রদর্শন করে বেড়ায় এবং যুবসমাজের একটা বিরাট অংশকে টাকার থলি দেখিয়ে অসামাজিক কাজে ভিড়িয়ে দেয়, এদের আশীর্বাদের হাত মাথায় আছে বলেই আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়েও ভোটবাজ দলগুলো পার পেয়ে যায়— মানুষ তা বিলক্ষণ জানে। তাই সরকার-প্রশাসনের এই নীরবতা এবং তার তাঁবেদার পুলিশগোষ্ঠীর গা-ছাড়া ভাবভঙ্গির কারণ তাদের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। অগ্নিকাণ্ডে এতগুলো মানুষের মৃত্যুর পর জানা গেল, এরকম গুদাম চালাতে গেলে যে অগ্নিসুরক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা ও অনুমতি (ফায়ার লাইসেন্স) লাগে তা ছিল না, বছরের পর বছর সেখানে কোনও ফায়ার অডিট হয়নি। এই গুদাম দুটি যেখানে তৈরি হয়েছে, সেই পূর্ব কলকাতার জলাভূমি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি 'রামসার অঞ্চল', যেখানে জলাভূমি বুজিয়ে এই ধরনের নির্মাণ সম্পূর্ণ বেআইনি। যে খেয়াদহ-২ পঞ্চায়েতের অধীনে এই এলাকা, তারা জানিয়েছে পঞ্চায়েত থেকে গুদাম তৈরির কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং বছরের পর বছর পঞ্চায়েতকে বকেয়া কর না দিয়েই এদের ব্যবসা চলছিল। সরকারের চোখের সামনে এতগুলো বেআইনি কাজ এত বছর ধরে চলতে পারল কী করে, পুলিশ-প্রশাসন কেন কোনও পদক্ষেপ নিল না, আইনভঙ্গকারীরা কীভাবে অপরাধ করেও ছাড়া পেয়ে গেল— এ সব প্রশ্ন এ রকম প্রতিটি দুর্ঘটনার পর কিছুদিন কাগজপত্রে আসে, তারপর আবার হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, যতদিন না অন্য কোনও জতুগৃহে, ম্যানহোলের বিষাক্ত গ্যাসে, উঁচু ভারা থেকে পড়ে গরিবগুরবো শ্রমিকরা মরে গিয়ে সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলে।

যে নাজিরাবাদে এই ঘটনা ঘটল, সেই অঞ্চল বাস্তুতন্ত্রগত ভাবে সংবেদনশীল পূর্ব কলকাতা জলাভূমির অংশ, যা গোটা শহরের বর্জ্য এবং নিকাশির সাথে যুক্ত। অথচ এই ঘটনা নতুন করে জানান দিল, এমন আরও অসংখ্য বেআইনি নির্মাণ সেখানে চলছে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। 'ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি'-র তথ্য বলছে, ২০০৭-এর জুলাই থেকে ২০২১-এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে এরকম ৩৫৮টি বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ বিভিন্ন থানায় নথিভুক্ত হয়েছে। ২০২৪ সালে এর নথিভুক্ত সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ৫০০। যে বিজেপি আজ ২০২৬-এর ভোটের তাড়নায় বিরাট শ্রমিকদরদি সাজছে, সেই বিজেপি শাসিত ডবল ইঞ্জিন রাজ্য গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সহ নানা রাজ্যে সাম্প্রতিক অসংখ্য দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যুর পরিসংখ্যান দেখিয়ে দেয়, ৭৮ বছরের স্বাধীন দেশে শ্রমিকের প্রাণ বড় সস্তা জিনিস। সরকারি তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর অন্তত ১১০০ থেকে ১৩০০ শ্রমিক এ দেশে মারা যান শুধু কর্মক্ষেত্রের দুর্ঘটনায়। সাম্প্রতিক শ্রম-আইনে নানা ভাল ভাল কথার আড়ালে ভয়ঙ্কর ভাবে খর্ব করা হয়েছে শ্রমিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। শ্রমিক সুরক্ষার কোনও বালাই না রেখেই যাতে কোম্পানিগুলো মুনাফার পাহাড়ে উঠতে পারে এবং শ্রমিকরা প্রতিবাদও না করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা আরও পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছে নতুন শ্রম কোড।

কাজেই ক্ষমতায় যেই আসুক, বেলাগাম শ্রমিক শোষণ এবং সর্বোচ্চ মুনাফার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা এই ব্যবস্থার সেবাদাস সব সরকারই। ভোটের আগে জনসেবার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং ক্ষমতায় জিতে এসে পরের ভোট পর্যন্ত মানুষের ওপর শোষণ অত্যাচার চালিয়ে পুঁজিকে খুশি করা— এটাই আজকের 'গণতন্ত্রে' সবচেয়ে বড় বাস্তব। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক ফ্রেডরিক এঙ্গেলস 'ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা' এই বইতে লিখেছিলেন— 'একজন যখন আরেক জনকে শারীরিকভাবে আহত করে এবং তার মৃত্যু হয়, আমরা সেটাকে বলি নরহত্যা। ... অথচ একটা সমাজ যখন শত শত সর্বহারাকে এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করায়, যখন সমাজ হাজার হাজার মানুষকে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলো থেকে বঞ্চিত করে, ... মানুষগুলো নিশ্চিতভাবেই মারা যাবে জেনেও সেই অবস্থাকেই দিনের পর দিন চলতে দেয়, তখন সেটাও হত্যা, একজনের আরেকজনকে খুন করার মতোই'। নাজিরাবাদে শ্রমিকের বীভৎস মৃত্যু এবং সরকার-রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অসংবেদনশীলতা প্রমাণ করল, শ্রমিকের ঘাম-রক্তে গড়ে ওঠা এই মুনাফাসর্বস্ব সমাজই শ্রমিকের হন্তারক। একে ভাঙতে না পারলে শ্রমিকের মুক্তি নেই।

জীবনাবসান

কলকাতায় দলের রাজারহাট লোকালের প্রবীণ কর্মী কমরেড সুকুমার চৌধুরী ২৩ জানুয়ারি বাগুইআটির একটি নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

১৯৬৪-'৬৫ সালে কলকাতা কর্পোরেশনে কর্মরত অবস্থায় তৎকালীন রাজ্য কমিটির সদস্য প্রয়াত কমরেড রবি বসু ও পরে কমরেড মণি চ্যাটার্জীর সংস্পর্শে আসেন এবং মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে দলের সাথে যুক্ত হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর পরিবারের সকল সদস্য সহ অন্যদের দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

১৯৮০-র দশকের শুরু থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তিনি এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কলকাতা কর্পোরেশন পৌরকর্মী ইউনিয়ন-এর সম্পাদক ছিলেন। কলকাতা কর্পোরেশন বিল্ডিং বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকাকালীন সৎ এবং নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে অফিসার থেকে সাধারণ কর্মচারী সকলের কাছে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁর সহজ সরল ব্যবহার দলের সাধারণ কর্মী সহ এলাকার মানুষকে আকৃষ্ট করত। শারীরিকভাবে যত দিন সক্ষম ছিলেন দলের দেওয়া বিভিন্ন দায়িত্ব তিনি গুরুত্বের সঙ্গে পালন করেছেন। প্রবল অসুস্থতার মধ্যেও দলের মুখপত্র গণদাবী নিয়মিত পড়তেন এবং দলের নানা কর্মসূচি ও কমরেডদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন।

কমরেড সুকুমার চৌধুরী ছিলেন উচ্চ মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ। মৃত্যুর পরে তাঁর দেহ যাতে সমাজের এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে লাগে, সেই জন্য তিনি দেহদান করেছিলেন। মরদেহ বাড়িতে আনলে দলের কর্মীরা সহ এলাকার সাধারণ মানুষ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ীর পক্ষে মাল্যদান করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সত্যেন ভট্টাচার্য। এ ছাড়াও রাজারহাট লোকাল সম্পাদক কমরেড জগন্ময় কর্মকার সহ বিভিন্ন ফ্রন্টের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়।

কমরেড সুকুমার চৌধুরী লাল সেলাম

মুর্শিদাবাদ জেলায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বাগডাঙা লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড রেজাউল করিম ২৫ জানুয়ারি সকালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

কমরেড রেজাউল করিম প্রয়াত কমরেড সিরাজুদ্দিন আহমেদ ও পূর্বতন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড শিবপূজন সোনারের মাধ্যমে দলের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ১৯৭৮ সাল থেকে পরপর তিন বার পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। তাঁর সততা ও নিষ্ঠা তাঁকে এলাকার মানুষের কাছে আপনজন করে তোলে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গত ও অসহায় মানুষের সাহায্যে তিনি ছুটে যেতেন। তাঁর সহজ সরল অমায়িক ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করত। শিশুদের প্রতি তাঁর ছিল দরদি মন। মৃত্যুর আগে শয্যাশায়ী অবস্থায় দলের কর্মসূচির খোঁজ-খবর নিতেন। যখন হাঁটা-চলা প্রায় বন্ধ তখনও তিনি ঘরে বসে বা বিছানায় শুয়ে থেকেও দলের পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পড়তেন।

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এলাকার কমরেডরা তাঁর বাসভবন নওসেরা গ্রামে উপস্থিত হন। দলের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ওহিরুজ্জামান, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড উত্তম সোনার এবং বাগডাঙা ও ভগবানগোলা লোকালে দলের কর্মী-সমর্থকরা তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শেষ বিদায় জানান।

কমরেড রেজাউল করিম লাল সেলাম

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা

ভি আই লেনিন

পুরনো বস্তুবাদের অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতা দেখে মার্ক্স নিশ্চিত ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, "বস্তুবাদের ভিত্তির সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং সেই অনুসারে তাকে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন"। বস্তুবাদ সব সময়ই চেতনাকে ব্যাখ্যা করে বাস্তব বস্তুসত্তার ফলাফল হিসাবে, এবং দেখায় এর বিপরীতটা সত্য নয়। তাই মানুষের সামাজিক জীবনে বস্তুবাদ প্রয়োগ করা হলে সামাজিক চেতনাকে সামাজিক বাস্তবের ফলাফল হিসাবেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

মার্ক্স লিখেছেন (*পুঁজি*, খণ্ড ১) ঃ 'উৎপাদনের হাতিয়ার এবং তার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আদানপ্রদানের ধরন। উৎপাদনের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার সাহায্যে মানুষ তার জীবন বাঁচিয়ে রাখে। এর মধ্য দিয়েই জন্ম নেয় সামাজিক সম্পর্কগুলি, তার থেকেই গড়ে ওঠে মানসিক ধারণার ধাঁচাটি। মানব সমাজ ও মানব ইতিহাসের ওপর প্রয়োগ করা বস্তুবাদের মূলনীতিগুলির পূর্ণাঙ্গ সূত্র মার্ক্স তাঁর 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনায় অবদান প্রসঙ্গে' (কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি) রচনার ভূমিকায় এই ভাবে দিয়েছেন ঃ বেঁচে থাকার উপকরণগুলি সামাজিক ভাবে উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ এক অপরিহার্য এবং তার ইচ্ছা নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট সম্পর্কে প্রবেশ করল— তা হল উৎপাদন সম্পর্ক। এই সম্পর্ক মানুষের বস্তুগত উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সেই নির্দিষ্ট স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই সব উৎপাদন-সম্পর্কগুলির সমষ্টি থেকেই গড়ে ওঠে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, যা হল বাস্তব ভিত্তি। এর উপর ভর করে একটি আইনি ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে এবং যা সমাজচেতনার একটি নির্দিষ্ট রূপের সঙ্গে খাপ খায়। জীবনধারণের বস্তুগত উপাদানগুলির উৎপাদনের পদ্ধতিটি সাধারণ ভাবে মানবজীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিগত পদ্ধতিটিকে স্থির করে দেয়। মানুষের চেতনা তার অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না, বরং বিপরীত ভাবে, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনা নির্ধারণ করে। বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরে এসে, সমাজের বস্তুগত উৎপাদিকা শক্তিগুলির সংঘাত বাধে বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে। অথবা ওই একই কথা আইনের ভাষায় বলতে গেলে, যে সম্পত্তি-সম্পর্কের মধ্যে উৎপাদিকা শক্তিগুলি এত দিন ক্রিয়াশীল ছিল, সংঘাত বাধে তার সঙ্গে।

উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশের একটা রূপ থেকে এই সম্পর্ক পরিণত হয়ে যায় তার শৃঙ্খলে। তখনই শুরু হয়ে যায় সামাজিক বিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সঙ্গেই বিপুলাকার উপরিকাঠামোর পুরোটাই কম-বেশি দ্রুত গতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই রূপান্তরগুলি বিচার করার সময় আমাদের সর্বদাই পার্থক্য করতে হবে— উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থার বস্তুগত পরিবর্তন— প্রকৃতি বিজ্ঞানের নির্ভুলতায় যা নির্ণয় করা যায় এবং আইনগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নান্দনিক বা দার্শনিক, সংক্ষেপে মতাদর্শগত রূপগুলি, যার মধ্য দিয়ে মানুষ এই সংঘর্ষ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার নিষ্পত্তি ঘটায়— এই উভয়ের মধ্যে।

"একজন মানুষ নিজের সম্পর্কে যা ভাবে, তার ওপর ভিত্তি করে যেমন আমরা তার সম্পর্কে মতামত গড়ে তুলি না, তেমনই রূপান্তরের এমন একটি সময়কালকে তার নিজস্ব চেতনা দিয়ে আমরা বিচার করতে পারি না। বিপরীতে, এই চেতনার ব্যাখ্যা হওয়া উচিত বস্তুগত জীবনের দ্বন্দ্বগুলি দিয়ে, সামাজিক উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে চলতে থাকা দ্বন্দ্ব দিয়ে। ..." ... ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার আবিষ্কার, কিংবা আরও সঠিক ভাবে বললে, সামাজিক ঘটনাবলির ক্ষেত্রে বস্তুবাদের সুসঙ্গত ধারাবাহিকতা ও প্রসার আগেকার ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলির দুটি প্রধান ত্রুটি দূর করেছিল। প্রথমটি হল, খুব বেশি হলে এই সব তত্ত্ব মানুষের ঐতিহাসিক কার্যকলাপের পিছনে মতাদর্শগত প্রেরণাগুলি কী, তা অনুসন্ধান করেছে, এই সব প্রেরণার উৎস কী— তা অনুসন্ধান করেনি। সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থাটির বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে যে বাস্তব নিয়মগুলি— তা নির্ধারণ করেনি। বস্তুগত উৎপাদনের মাধ্যমে বিকাশের মাত্রায় পৌঁছনো এই সম্পর্কগুলির উৎসের দিকে চোখ রাখেনি।

দ্বিতীয়ত, আগেকার তত্ত্বগুলি অধিকাংশ জনগণের কার্যকলাপকে বিচারের মধ্যে আনেনি। সেখানে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদই প্রথম জনজীবনের সামাজিক অবস্থা ও তার পরিবর্তনগুলি বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুলতার সঙ্গে চর্চা করেছে। প্রাক-মার্ক্সবাদী 'সমাজবিদ্যা' ও ইতিহাস-রচনা বড় জোর সামনে এনেছিল যথেচ্ছ ভাবে সংগ্রহ করা কাঁচা তথ্যের রাশি এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার আলাদা আলাদা দিকগুলি। মার্ক্সবাদ পরস্পরবিরোধী সমস্ত প্রবণতার সামগ্রিকতা বিচার করল, সেগুলিকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির জীবনযাত্রা ও উৎপাদনের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাযোগ্য অবস্থায় দাঁড় করাল। কোনও একটি ধারণা কেন বিশেষ ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে তার বিচার করল এবং শেষ পর্যন্ত এ সত্য দেখাল যে কোনও ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল ধারণা ও প্রবণতার উৎস হচ্ছে বস্তুগত বিষয়গুলির উৎপাদন ব্যবস্থা।

একটি সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ ও বিনাশের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে কী ভাবে বিচার করতে হয় তা মার্ক্সবাদ দেখিয়েছে। জনগণ নিজের ইতিহাস নিজেরাই সৃষ্টি করে। কিন্তু জনগণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়? অর্থাৎ, কিসের থেকে বিবাদমান ধ্যানধারণার সংঘর্ষের উদয় হয়? মানব সমাজের বিপুল অংশে এই সমস্ত সংঘাতের সামগ্রিক ফলটি কী? বস্তুগত জীবনের উৎপাদন, যা মানুষের সমস্ত ঐতিহাসিক কার্যকলাপের ভিত্তি গঠন করে, তার বাস্তব শর্তগুলি কী কী? এই সব শর্তের বিকাশের নিয়ম কী? এই সবগুলি বিষয়ের ওপর মার্ক্স মনোযোগ দেন এবং ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত চর্চার পথনির্দেশ করেন, যা তার বিপুল বৈচিত্র্য ও পরস্পরবিরোধিতা সত্ত্বেও একটি একক পদ্ধতি হিসাবে নির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়।

'মহান দার্শনিক কার্ল মার্ক্স ও তাঁর মতবাদ' থেকে

আর্থিক সমীক্ষা

একের পাতার পর

কর্তাদের দেশের গরিব মানুষের করের টাকায় বিপুল ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রাখা হয়! এই রকম অস্বচ্ছ, গোলানো আর্থিক সমীক্ষার ভিত্তিতেই নাকি দেশের আর্থিক বাজেট তৈরি করে সরকার! সেই বাজেট কেমন হতে পারে, কতটা সাধারণ মানুষের খোঁজ রাখতে পারে তা এই সমীক্ষা পেশের দু'দিন বাদে অর্থমন্ত্রীর পেশ করা বাজেটেই আবার প্রমাণ হয়ে গেছে।

আর্থিক সমীক্ষকরা অবশ্য দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে সংকটের কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেননি। তাঁরা বিদেশে পরিষেবা রপ্তানির বদলে পণ্য উৎপাদন ও তা রপ্তানির ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। ভারতের বিপুল শ্রমশক্তি এবং সম্পদকে পুঁজি হিসাবে উৎপাদনে কাজে লাগানোর জন্য আর্থিক সমীক্ষা নিদান দিয়েছে এই দুই সম্পদকে 'দক্ষ পরিচালনায়' উৎপাদনের কাজে লাগালেই সমস্যার সমাধান হবে! ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে শিল্প উৎপাদনের সমস্যা কি নিছক দক্ষ পরিচালনার অভাব? নাকি আসল সমস্যা হল দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গিয়ে অভ্যন্তরীণ বাজারের তীব্র সংকট?

কিন্তু এই সত্যটা স্বীকার করার উপায় আর্থিক উপদেষ্টা থেকে শুরু করে মন্ত্রী-আমলা কারও নেই। এই তথাকথিত দক্ষ পরিচালনার জন্য তাঁরা আর কয়েকটা নিদান দিয়েছেন— প্রথমত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সংজ্ঞা বদলে দিয়ে এই সমস্ত সংস্থায় সরকারি শেয়ার ২৬ শতাংশের নিচে নিয়ে যাওয়া এবং যে সংস্থাগুলি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে গেছে সেগুলি থেকে সরকারের পুরোপুরি বেরিয়ে যাওয়া। তাঁরা এমনও বলেছেন, শ্রম আইন সংশোধন করে 'শ্রম কোড' চালু হওয়ার ফলে উৎপাদনের পরিবেশ তৈরি হয়ে আছে। এবার তাকে কাজে লাগাতে হবে। অর্থাৎ, বলতে চাইছেন, শ্রমিককে যথেচ্ছ খাটানো এবং কোনও সুযোগ সুবিধা না দিতে হলেই উৎপাদন একেবারে চড়চড় করে বাড়বে!

আর একটা নিদান হচ্ছে, গ্রামীণ বা শহরের রোজগার গ্যারান্টি স্কিমগুলিকে মানুষকে কাজ দেওয়ার স্কিমের বদলে উৎপাদনের প্রয়োজনের ভিত্তিতে কাজের স্কিমে পরিণত করা। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 'ভিবিজি রামজি' বিল এনে গ্রামীণ মানুষের রোজগার যোজনায় গ্যারান্টি তুলে দেওয়ার যে কাজটি করতে চেয়েছে আর্থিক সমীক্ষার সুপারিশ সেই দিকেই। সরকার এখন শহরের পরিকাঠামো শুধু নয়, গ্রামীণ পরিকাঠামো, পানীয় জল, সেচ সমস্ত কিছুই ধীরে ধীরে বেসরকারি পুঁজির হাতে তুলে দিতে চাইছে।

গ্রামীণ মানুষের কাজের বিষয়টা এই পুঁজিপতিদের মুনাফার সাথে যুক্ত করে দেওয়ার সুপারিশই করল আর্থিক সমীক্ষা। মনে করিয়ে দেওয়া ভাল ইতিমধ্যে মার্কিন শুল্ক আক্রমণের চাপে ভারতের বস্ত্র, জুতো, চামড়ার নানা দ্রব্য, রত্ন ও গয়না ইত্যাদি শ্রমনিবিড় শিল্প সংকটে। এই পরিস্থিতিতে এই ক্ষেত্রে লগ্নি করা পুঁজি মালিকদের বাঁচাতে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যাকে সামাল দিতে সম্প্রতি এই ক্ষেত্রগুলোর জন্য ইউরোপীয় বাজারের বরাত পাওয়ার চেষ্টা করছে মোদি সরকার। এই বরাত যদি শেষ পর্যন্ত জোটেও তীব্র বাজার সংকট এবং আরও তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোপ পড়বে শ্রমিকের সংখ্যা এবং তার মজুরিতেই। ফলে শেষ পর্যন্ত কর্মসংস্থানের আশা নেই, রয়েছে ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত এই আর্থিক সমীক্ষকরা স্কুলছুট নিয়ে দুঃখে কাতর হয়ে সুপারিশ করেছেন, একেবারে নিচু ক্লাস থেকে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষা দিয়ে শিল্প জগতের উপযোগী করে তুলতে পারলে তারা রোজগার করবে, ফলে আর স্কুলছুট হবে না। অপূর্ব প্রজ্ঞা! ছাত্র-ছাত্রীরা বেশিরভাগই মাঝ পথে পড়া বন্ধ করে কেন? কোথায় যায় তারা? হয় কোনও কাজে ঢোকে, না হয় মা-বাবা-দাদা-ভাই-বোন সকলে কাজে যায় বলে তাকে ঘরের দায়িত্ব আগলাতে হয়। এবার এই ছাত্র-ছাত্রীদের কারিগরি বিদ্যা শিখিয়ে দিলেই তারা কাজে না গিয়ে সব স্কুলে ভিড় করবে? না কি যেটুকু পড়াশোনা করছিল তাও ছেড়ে কাজের সন্ধানে দেশ বিদেশে ছুটবে? দারিদ্রটাই যেখানে আসল রোগ, সেখানে পরিবারের দারিদ্র মোচনের চেষ্টা না করে, বাবা মায়ের উপযুক্ত রোজগারের ব্যবস্থা না করে এই নিদান আসলে কী জন্য? পুঁজি মালিকদের জন্য সস্তার মজুর সরবরাহই নয় কি? তাহলে মহা আড়ম্বরে শিক্ষার অধিকার নিয়ে প্রচারের মানে কী? বরং শুধু সন্তানের পড়াশোনার জন্যই তো সরকার দরিদ্র পরিবারগুলোকে অর্থ সাহায্য করতে পারত! যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমবাহিনী যদি সত্যিই মোদি সরকারের লক্ষ্য হত তাদের হ্যাঁ-তে হ্যাঁ মেলানো এই সমীক্ষকদের তারা তো এই সুপারিশটা করতে বলতে পারত!

সব মিলিয়ে আর্থিক সমীক্ষা আসলে মোদি সরকারকেও কোনও দিশা দেখাতে ব্যর্থ। কারণ তীব্র যে সংকটে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জর্জরিত তার থেকে মুক্তির কোনও উপায় কোনও নিদানে নেই। এই ব্যবস্থার সর্ব অঙ্গে ঘা, পুলটিশ বাঁধবে কোথায়? কিন্তু পুঁজিপতিদের সেবকদের তো এ কথা মানলে চলে না। ফলে হুকুম-বরদার আর্থিক উপদেষ্টাদের পণ্ডিতপ্রবর সেজে এমন বিড়ম্বনা না সয়ে উপায় থাকে না।

দশ দফা দাবিতে সিএসপি কর্মীদের নবান্ন অভিযান

কেন্দ্রের এনআরএলএম রাজ্যে (ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুডস মিশন) আনন্দধারা প্রকল্প হিসাবে পরিচিত। এই প্রকল্পে কর্মরত সিএসপি (কমিউনিস্ট সার্ভিস প্রোভাইডার) কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতি এবং এনগেজমেন্ট লেটার দেওয়া সহ দশ দফা দাবিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা সিএসপি কর্মী ইউনিয়নের ডাকে ২৭ জানুয়ারি নবান্ন অভিযান কর্মসূচি ঘিরে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বড় জমায়েত হয় (ছবি)। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কর্মীরা এ দিন তাঁদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও অনিশ্চিত কর্মপরিস্থিতির বিরুদ্ধেসরব হন। কর্মীরা কলেজ স্ট্রিটে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে জমায়েত হয়ে সেখান থেকে মিছিল করে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে আসেন। বিক্ষোভ সমাবেশে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস, রাজ্য সহ সভাপতি নন্দ পাত্র, স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ও পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন-এর সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন, পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী (কন্ট্র্যাকচুয়াল) ইউনিয়ন-এর সভাপতি রুনা পুরকাইত, সারা বাংলা সিএসপি কর্মী ইউনিয়ন-এর আহ্বায়ক মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, নির্দিষ্ট নিয়োগপত্র না থাকায় বহু জায়গায় তুচ্ছ অজুহাত কিংবা সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির কারণে কর্মীদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। আতঙ্কের পরিবেশে কর্মীদের কাজ করতে হয়। সমাবেশ থেকে সম্পাদিকা ঝর্ণা রায়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে ডেপুটেশন দেন এবং সহ সম্পাদক নিবেদিতা দাস সরদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল নবান্নে ডেপুটেশন দেন। তাঁদের মূল দাবির মধ্যে রয়েছে সরকারি মিনিমাম ওয়েজ অনুযায়ী ১২ হাজার টাকা বেতন, স্থায়ীকরণ, এনগেজমেন্ট লেটার দেওয়া, সামাজিক সুরক্ষা, কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণসহ মোট দশটি দাবি। দাবিগুলি মানা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় সভা থেকে।

হোটেলে শিক্ষিকা খুন

দুষ্কৃতীদের শাস্তির দাবিতে তমলুকে বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুরে তমলুকের রামতারকে একটি হোটেলে মৃত শিক্ষিকার খুনির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ওই হোটেলটি সহ জাতীয় সড়কের ধারে সমস্ত বার, হোটেল ও মদের দোকান বন্ধ করতে ২৮ জানুয়ারি এআইএমএসএস-এর নেতৃত্বে তমলুক থানায় বিক্ষোভ হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা নেত্রী প্রতিমা জানা, পুতুল দোলই, প্রতিমা অধিকারী, সিক্তা মাজী প্রমুখ। ৩০ জানুয়ারি ওই হোটেলের সামনে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ হোটেলটি সিল করে দিতে বাধ্য হয়।

তমলুক থানার পুলিশ প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম মাইতি সহ কয়েকজন আন্দোলনকারীর নামে এফআইআর করে। এআইএমএসএস নেতৃত্ব এতে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় বাজেট ঃ অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা বুলি

একের পাতার পর

পরিভাষার অতিরিক্ত ব্যবহারে যথাসম্ভব দুর্বোধ্য করে তোলা হয়েছে এবং এটিতে বৃহৎ পুঁজিপতি ও কর ফাঁকিদাতাদের আরও বেশি সুবিধা ও ছাড় দেওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ভুল মাপকাঠি এবং অনুপযুক্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রেক্ষাপটে দেখলে ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার দাবিটি একটি সুস্পষ্ট মিথ্যাচার।

ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি, টাকার অবমূল্যায়ন, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, শিল্পকারখানা বন্ধহয়ে যাওয়া, সীমাহীন ছাঁটাই, দরিদ্র কৃষকদের আয় হ্রাস এবং সমগ্র কৃষিক্ষেত্রকে দ্রুত বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার মতো বিষয়গুলো একটি বারও উল্লেখ করা হয়নি। অথচ এগুলোই মানুষের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। নাগরিকদের ‘জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য’ নিয়ে কোনও উদ্বেগ দেখানোর পরিবর্তে ‘ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য’ বিষয়টিই প্রকটভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

বার্ষিক বাজেটকে মৌলিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান, জনগণের জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং ক্রমশ দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয়দের কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের ঘোষণা ছাড়াই একটি নিছক পণ্ডিতিপূর্ণ দলিলে পরিণত করার এই প্রহসনের প্রতি আমরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছি এবং এই বাজেটকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করছি।

বেলদায় রেল পরিষেবার উন্নতির দাবিতে গণঅবস্থান

পশ্চিম মেদিনীপুরে বেলদা ২৪ নম্বর রেলগেটে ওভারব্রিজ স্থাপনের কাজ অবিলম্বে শুরু, বেলদা লোকাল ট্রেনকে বেলতলা-হাওড়া সরাসরি চালানো, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতগামী, দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ, বাঘাযতীন জাজপুর খুরদা রোড ট্রেনটিকে পূর্বের মতো লোকাল ট্রেন হিসাবে চালানো সহ একগুচ্ছ দাবিতে ২৫ জানুয়ারি বেলদা রেলযাত্রী ও নাগরিক কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে বেলদা শহরে মিছিল ও গণঅবস্থান অনুষ্ঠিত হয়। বেলদা ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল শুরু হয়ে কেশিয়াড়ি মোড়ে শেষ হয়। শতাধিক মানুষ মিছিলে পা মেলান। রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে চলে অবস্থান কর্মসূচি। বহু বিশিষ্ট মানুষ সমাবেশে উপস্থিত থেকে তাদের সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন।

বেলদা রেলযাত্রী ও নাগরিক কল্যাণ সমিতির সম্পাদক রামলাল রাঠি, সভাপতি প্রদীপ দাস জানান ২০১৪ সাল থেকে বেলদা স্টেশনের সার্বিক উন্নয়নের দাবিতেই লাগাতার আন্দোলন চলছে।

তাঁরা বলেন, রেল দফতর এই দাবি না মানলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনে রেল অবরোধ করতে বাধ্য থাকব।

জেলায় জেলায় পরিচারিকাদের বিক্ষোভ

ঝাড়গ্রাম ঃ সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন সুনিশ্চিত করা, সবেতন সাপ্তাহিক ছুটি, বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনাতে সকল পরিচারিকাকে অন্তর্ভুক্ত করার জটিলতা দূর করা, এক মাসের বেতন বোনাস হিসাবে দেওয়া, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সম্মানজনক পরিবেশ সুনিশ্চিত করা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, তামিলনাড়ু সরকারের মতো এ রাজ্যেও পরিচারিকাদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ সহ ৯ দফা দাবিতে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২৭ জানুয়ারি ঝাড়গ্রামে ডেপুটি লেবার কমিশনারের অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন সমিতির রাজ্য সহসভানেত্রী অর্চনা বেরা ও রাজ্য সম্পাদিকা জয়শ্রী চক্রবর্তী। প্রতিনিধিরা ডিএলসি-র মাধ্যমে শ্রমমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঁচ শতাধিক স্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জমা দেন।

ডিএলসি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা বিএমএসএসওয়াই-তে সকল পরিচারিকাকে অন্তর্ভুক্ত করার জটিলতা দূর করা এবং স্মারকলিপিটি শ্রমমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন জেলা সম্পাদিকা নীতিকণা মাইতি, অঞ্জনা পাল, সন্তোষী দোলাই, অঞ্জু মল্লিক, জায়েদা বিবি, মালতি রায়, শ্যামলী বারিক ও রূপা বৈঠা।

রঘুনাথপুর ঃ ২৮ জানুয়ারি পুরুলিয়া জেলায় সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির রঘুনাথপুর শাখার উদ্যোগে ক্ষুদিরাম চক থেকে পরিচারিকা মহিলারা মিছিল করে রঘুনাথপুর অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার অফিসে যান। ৯ দফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখান ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শ্রম দপ্তরের আধিকারিক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। উপস্থিত ছিলেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদিকা শোভা মাহাতো, রাজ্য কমিটির সদস্য শিবানী বাউরী সহ রঘুনাথপুর শহরের আটটি এলাকার শতাধিক পরিচারিকা মহিলা।

ভোটাধিকার হরণের প্রতিবাদে আসামে নাগরিক অধিকার রক্ষা সমন্বয় কমিটির বিক্ষোভ

ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন (এস আর) প্রক্রিয়ায় সত্যতা যাচাই না করে নির্বিচারে হাজার হাজার সংখ্যালঘু জনগণকে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে নোটিশ পাঠানো বন্ধ করা এবং প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকদের নাম ভোটার তালিকায় রাখার দাবিতে ২৯ জানুয়ারি নাগরিক অধিকার রক্ষা সমন্বয় কমিটি করিমগঞ্জ জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখায়। কমিটির এক প্রতিনিধি দল জেলা আয়ুক্তের সাথে সাক্ষাৎ করে স্মারকপত্র দেয় এবং তার মাধ্যমে আসামের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছেও স্মারকপত্র দেওয়া

হয়। প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন সুনীতরঞ্জন দত্ত, অরুণাংশু ভট্টাচার্য, রফিক আহমেদ চৌধুরী, বদরুল হক চৌধুরী এবং সন্দীপ নন্দী। তাঁরা বলেন, বিশেষ সংশোধনীর নামে বিজেপি নেতৃত্বাধীন আসাম সরকারের চক্রান্তে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ম বহির্ভূতভাবে মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করা চলছে। তাদের শুনানিতে হাজির হতে নির্বিচারে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশের পর লক্ষ্য করা গেছে যে, নিয়ম-নীতি ভেঙে একজন লোক শত শত নাগরিকের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করছে। এমনকি বহু জীবিত লোককে মৃত দেখিয়ে অভিযোগ দায়ের করে নাম কাটার হীন প্রচেষ্টা চলছে।

বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে অনেকের অজান্তেই তাদের এপিক ও ফোন নম্বর ব্যবহার করে শত শত অভিযোগ জমা পড়েছে। যেগুলি সম্পূর্ণ ভুয়ো। এ ধরনের যেমন খুশি আপত্তি দাখিলের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ সাংঘাতিক হয়রানির শিকার হচ্ছে। অভিযোগের শুনানির নামে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাজার হাজার লোককে শুনানি কেন্দ্রে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। বৃহৎ সংখ্যক লোককে আগের দিন সন্ধ্যায় নোটিস দিয়ে সাত দিনের সময়সীমার নীতি লঙ্ঘন করে পর দিন সকালে শুনানি কেন্দ্রে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে বহু লোক শুনানির সময় উপস্থিত হতে পারছেন না।

উপস্থিত জনসাধারণের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অরুণাংশু ভট্টাচার্য বলেন, আসামের মুখ্যমন্ত্রীর ভাষ্যে এই কথা স্পষ্ট যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের চাপে রাখতে, হয়রানি করতে নির্বিচারে নোটিশ জারি করা হয়েছে। এই ন্যক্কারজনক কাজের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০২৬ সালের নির্বাচনে একদিকে সংখ্যালঘুদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কাটা, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটিয়ে অসৎ উপায়ে বিজেপির জয় হাসিল করা। অথচ এই চক্রান্তের বলি হচ্ছেন এ রাজ্যের লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক। অতীতেও লক্ষ লক্ষ বৈধ ভারতীয় নাগরিকদের বেআইনিভাবে ‘ডি’ ভোটার বানিয়ে তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয় এবং ট্রাইবুনালে বিচারের নামে প্রহসন করে অনেককে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি করে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

কমিটির দাবি, নিয়ম বহির্ভূতভাবে একাধিক, এমনকি শয়ে শয়ে দাখিল করা অভিযোগ তাৎক্ষণিক ভাবে খারিজ করতে হবে। খুঁটিয়ে খোঁজ ও বাস্তব সমীক্ষা না করে দাখিল করা ভিত্তিহীন অভিযোগ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, অভিযোগকারী অনুপস্থিত থাকলে অভিযোগ সঙ্গে সঙ্গে খারিজ করতে হবে। সাজানো এবং মিথ্যা অভিযোগ দাখিলকারীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, শুনানিতে উপস্থিত থাকা এবং দাখিল করা তথ্য-প্রমাণের তালিকার প্রমাণপত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে সিলমোহর সহ অভিযুক্তকে দিতে হবে, নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য রাজ্যের সর্বত্র একই ধরনের নথিপত্র স্থির করতে হবে। ইচ্ছেমতো এবং মর্জিমাফিক নথিপত্র চাওয়া চলবে না, সুস্থ এবং সুশৃঙ্খল পরিবেশে শুনানির ব্যবস্থা করতে হবে। শুনানি কেন্দ্রে বসার আসন, পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। যথেষ্ট সংখ্যক আধিকারিক-কর্মচারীর ব্যবস্থা করতে হবে।

এসআইআর হয়রানি ঃ জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

মুর্শিদাবাদ ঃ এসআইআর-এর শুনানির নামে মানুষের হয়রানি, ভাষা ও ধর্মের কারণে পরিযায়ী শ্রমিকদের হত্যার প্রতিবাদে এবং জনজীবনের বিভিন্ন দাবি নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়ায় এস ইউ সি আই (সি) দলের পক্ষ থেকে ৩০ জানুয়ারি বিডিও দফতরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিন হরিহরপাড়া বাজারে ১৯৯২ সালে পুলিশের গুলিতে নিহত সপ্তশহিদ বেদির

পাদদেশে জমায়েত করে সংক্ষিপ্ত সভার পর মিছিল শুরু হয়। তিন শতাধিক মানুষের মিছিল হরিহরপাড়া বাজার ঘুরে বিডিও অফিস পৌঁছয়। সেখানে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করলে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিভিন্ন বক্তা সভায় বক্তব্য রাখেন। একটি প্রতিনিধিদল বিডিওর সঙ্গে দেখা করে দাবিপত্র জমা দেন।

নদিয়া ঃ এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানিতে যেভাবে অসুস্থ মানুষ বয়স্ক মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে তার প্রতিবাদে, মৃত বিএলও এবং ভোটার তালিকায় নাম থাকা না থাকা নিয়ে আতঙ্কে মৃত ভোটারদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, তাড়াহুড়ো না করে আরও সময় নিয়ে নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রকাশ সহ আট দফা দাবিতে ২৯ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে নদিয়া জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ হয় (ছবি)।

অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে দলের জেলা সম্পাদক অঞ্জন মুখার্জীর নেতৃত্বে চার জনের প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি পেশ করেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য জয়দীপ চৌধুরী, মশিকুর রহমান প্রমুখ।

তমলুকে নাগরিক সভা

আশা ও পৌরস্বাস্থ্য কর্মীদের আন্দোলনের সমর্থনে ২৮ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক হাসপাতাল মোড়ে নাগরিক সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভানেত্রী কৃষ্ণা প্রধান, বিশিষ্ট চিকিৎসক বিশ্বনাথ পড়িয়া সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কোলাঘাটে বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন

স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার, বর্ধিত ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জ বাতিল, বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল-২০২৬ বাতিল, আইন অনুযায়ী সিকিউরিটি নির্ধারণ ও সুদ দেওয়ার দাবিতে অ্যাবেকার উদ্যোগে ২৬ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরে কোলাঘাটের সিদ্ধা প্রাইমারি স্কুলে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একটি কনভেনশন হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন, সংগঠনের জেলা কমিটির অফিস সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। সভাপতিত্ব করেন সিদ্ধা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হামিদুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য কার্তিক চন্দ্র হাজরা। সভা থেকে কার্তিকবাবুকে সভাপতি করে ২৬ জনের একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

অ্যাবেকার ডাকে গ্রাহক বিক্ষোভ

বিদ্যুৎ বিভ্রাট, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গবাদি পশুর মৃত্যু, কৃষিতে বাঁশের খুঁটির বিপজ্জনক সংযোগ, সরকারি নির্দেশ না মেনে গৃহস্থে স্মার্ট মিটার লাগানোর ষড়যন্ত্র ইত্যাদির প্রতিবাদে অ্যাবেকার ডাকে ২৯ জানুয়ারি গ্রাহকরা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর বাসস্ট্যান্ডে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ দেখান।

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, স্মার্ট মিটার বিরোধী আন্দোলনের সহ সভাপতি আশীষ দে, ব্লক সম্পাদক গোবিন্দ ঘোষ প্রমুখ। শতাধিক গ্রাহকের একটি মিছিল ডিভিশন ম্যানেজারের দফতরে পৌঁছয়। স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ডিভিশন ম্যানেজার গ্রাহকদের দাবিগুলির সঙ্গে সহমত হন।

টোটো চালকদের বিক্ষোভ মালদায়

টোটো চালকদের উপর প্রশাসনিক হয়রানি ও রেজিস্ট্রেশনের নামে হাজার হাজার টাকা আদায় করার প্রতিবাদে ৫০ টাকার বেশি জরিমানা না করা, পরিবহণ শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, সমস্ত টোটোর রেজিস্ট্রেশন সহ অন্যান্য দাবিতে ২৮ জানুয়ারি এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা ই-রিক্সা টোটো চালক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শতাধিক টোটো চালক মালদার পল্লীশ্রী মাঠ থেকে মিছিল করে জেলাশাসক অফিসের সামনে মালদা আরটিও-কে ডেপুটেশন দেন। জমায়েতে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি অংশুধর মণ্ডল। আরটিও ইউনিয়নের দাবিগুলোর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

পাঠকের মতামত

ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ ও গ্রাহক স্বার্থ

‘পুঁজিপতিদের ঋণ মকুব করতে ব্যাঙ্কে সুদের হার কমানো হচ্ছে’ শীর্ষক নিবন্ধ (গণদাবী, ৭৮ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ৯-১৫ জানুয়ারি ২০২৬) প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা।

প্রথম কথা, নিবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিরোনাম ঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে আমার মনে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ‘পুঁজিপতিদের ঋণ মকুব করতে ব্যাঙ্কের গ্রাহক এবং কর্মচারীদের উপর আঘাত হানা হচ্ছে’ কিংবা ‘ব্যাঙ্কগ্রাহক এবং কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে ধনকুবেরদের ঋণ মকুব করা হচ্ছে’— এই জাতীয় কোনও শিরোনাম হলে সঠিক হত বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়ত বিষয়বস্তু নিয়েও কিছু স্বচ্ছতা প্রয়োজন। ঋণ মকুব করার প্রশ্নে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের দুটো দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। ধনকুবেরদের থেকে ঋণ আদায়ে যে মনোভাব কাজ করে গরিব-মধ্যবিত্তদের থেকে সেই ব্যাপারে দেখা যায় অনেকটা বিপরীত মনোভাব। ধনকুবেরদের মোটা অঙ্কের ঋণ অনাদায়ী থাকতে থাকতে এক সময় যে ভাবে সহজে মকুব হয়ে যায়, গরিব মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে তা হয় না। মোটা অঙ্কের টাকা ঋণ নিয়ে যিনি শোধ করতে পারছেন না, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে তিনি ঋণ পেয়েছিলেন তা বিক্রি করেও যখন ঋণ পরিশোধ হওয়া সম্ভব নয়, তখন তো ওই ঋণগ্রহীতার শাস্তি হওয়া উচিত। ওই ঋণ যিনি অনুমোদন করেছিলেন তাঁর সব কিছু খতিয়ে দেখে শাস্তি হওয়া উচিত। সে রকম কিন্তু হয় না। উল্টে গরিব-মধ্যবিত্তদের ঋণ আদায়ে চলে নানা রকম উৎপীড়ন।

অনাদায়ী ঋণ অনুৎপাদক সম্পদে পরিণত হওয়ার পরও চলে এই উৎপীড়ন। তাতেও কাজ না হলে খবরের কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়ে এই সব মানুষের সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে ঋণ শোধ হয়। এমন বিজ্ঞাপন মাঝে মাঝে বিভিন্ন পত্রিকায় আমাদের চোখে পড়ে। যে কারণে খাতা থেকে মুছে দেওয়া অনুৎপাদক সম্পদও কিছু কিছু উদ্ধার হয়। সে কথাই শুনিয়েছেন মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী। কিন্তু, যে সমস্ত ধনকুবের ব্যাঙ্ক থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করলেও তাদের ঋণ মকুব হয়ে যায়, ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ হলে তাঁরাই হবেন ব্যাঙ্কের মালিক, বিশাল পরিমাণ ব্যাঙ্ক আমানতের নিয়ন্ত্রক। সরকারি ব্যাঙ্কেই গরিব-মধ্যবিত্তরা যদি অবহেলিত হন তবে বেসরকারি ব্যাঙ্কে তাঁদের অবস্থা কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। অথচ ব্যাঙ্কের আমানতের সিংহভাগই হল গরিব, মধ্যবিত্তদের। বেসরকারি ব্যাঙ্ক ডুবে গেলে তার পরিণতি কী হয়েছে বা কী হতে পারে তা নিবন্ধেই উল্লেখ আছে।

ব্যাঙ্কসংযুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে এখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১২। এটাকে ৩-৪টি ব্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে পুনরায় সংযুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে। যে সংযুক্তি হয়েছে তাতে কার উপকার হয়েছে? তবে সংযুক্তিকরণের পর ৭ হাজার ১০১টি শাখা বন্ধ হয়ে গিয়েছে যার ফলে প্রান্তিক চাষি, ছোট ব্যবসায়ী, গরিব আমানতকারীদের মতো গ্রাহকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। গত সংযুক্তিকরণের সুবাদে কর্মী সংখ্যা ৮.৫৭ লক্ষ থেকে কমে ৬.৯৪ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। এমনকি অনুৎপাদক সম্পদ বা এনপিএ-র পরিমাণও কমার পরিবর্তে বেড়েছে। এসবিআই-তে ১৬ শতাংশ, ব্যাঙ্ক অব বরোদায় ২৩ শতাংশ এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ৩৫ শতাংশ এনপিএ বেড়েছে সংযুক্তিকরণের পর। সংযুক্তির পর প্রতি শাখায় গড়ে গ্রাহকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০০০ এরও বেশি। অথচ চিনে এই সংখ্যা ৩৫০০ এবং সারা বিশ্বে এই সংখ্যার গড় হল ৪২০০।

সুদের হার কমানোর যে কথা এখানে বলা হয়েছে সেখানে সব ক্ষেত্রে কিন্তু সুদের হার কমানো হয় না। আমানতের ক্ষেত্রে সুদ কমানো হলেও ঋণের ক্ষেত্রে সেই অনুযায়ী কমানো হয় না। আবার যে সব ক্ষেত্রে কমানো হয় সেখানে এমন ভাবে কমানো হয় তার সুফলও পায় মূলত ধনকুবেররা।

এখানে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির কথা উঠেছে। অর্থ প্রতিমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত সাড়ে চার বছরে দেশে ৫,৮৩,২৯১টি ব্যাঙ্ক প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে এবং এর সঙ্গে জড়িত ৩৫৮৮.২২ কোটি টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কত টাকা উদ্ধার হয়নি তাও যেমন মন্ত্রী মশাইয়ের তথ্য থেকে জানা যায়নি, তেমনই কত জালিয়াত ধরা পড়ল, কারাই বা সেই জালিয়াত, জালিয়াতরা দেশান্তরিত হয়েছে কি না, তারও কোনও তথ্য প্রকাশিত হয়নি। ইতিমধ্যে বিজয় মাল্য, নীরব মোদি, মেহুল চোক্সিদের মতো ব্যাঙ্ক জালিয়াতদের অবস্থাই বা কী? অথবা তাঁদের থেকে জালিয়াতির কোনও টাকা উদ্ধার সম্ভব হয়েছে কি না সে ব্যাপারেও সরকার কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আনেনি।

এ সব ঘটনা থেকে আমাদের বুঝতে হবে ব্যাঙ্ক শিল্প বর্তমানে কাদের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কাদের স্বার্থে পরিচালিত হতে যাচ্ছে।

গৌরীশঙ্কর দাস,
খড়্গপুর

নেতাজি জন্মদিবস উপলক্ষে শীতবস্ত্র ও পুস্তক প্রদান

পূর্ব মেদিনীপুরে তমলুকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস উপলক্ষে ২৫ জানুয়ারি শীতবস্ত্র ও পুস্তক বিতরণ করল রিলিফ অ্যান্ড পাবলিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তমলুক শাখা।

পদুমবসান মক্তব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচিতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মোট ৫০ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রী ও পরিচারিকাদের বই এবং শীতের পোশাক দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠন ও এলাকার বহু বিশিষ্ট মানুষ। নেতাজির জীবনসংগ্রাম চর্চার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপিকা দীপ্তি মাইতি।

বিচারপতি প্রমাণ করলেন

একের পাতার পর

মালিকরা সব সময়েই শ্রমিকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তাদের শোষণের চরিত্রটাকে আড়াল করতে চায়। আবার শ্রমিকরা যাতে তাদের ন্যায্য দাবিগুলি তুলতে এবং তার জন্য আন্দোলন করতে না পারে এই প্রচারের দ্বারা সেটিও সিদ্ধ হয়। ফলে শ্রমিক শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতির এই বিষোদগারে দেশের মালিক শ্রেণি যেমন খুশি হবে, তেমনই মালিক শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার তথা সেবক হিসাবে নরেন্দ্র মোদিরাও খুশি হবেন। ফলে মালিক শ্রেণির ‘মন কি বাত’-ই উচ্চারিত হয়েছে বিচারপতির কণ্ঠে।

কারণ মালিক শ্রেণির সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিক শ্রেণির উপর শোষণকে আরও নির্মম করতে বিজেপি সরকার ৪৪টি শ্রম আইনকে ছেঁটে ৪টি শ্রমকোডে পরিণত করেছে। যেখানে কার্যত শ্রমিকদের সংগ্রামলব্ধ সমস্ত অধিকারগুলিই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে মালিকদের দেওয়া হয়েছে একচ্ছত্র শ্রমিক শোষণের অধিকার। আট ঘন্টার পরিবর্তে ১২ ঘন্টা শ্রম সময় আইনসিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অর্থাৎ ইউনিয়ন করার, ধর্মঘট করার অধিকারও কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধেই দেশ জুড়ে ১২ ফেব্রুয়ারি এআইইউটিইউসি সহ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

গত শতকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বিরোধী যুক্তফ্রন্ট সরকারের কথা অনেকের মনে থাকতে পারে। প্রথম যুক্তফ্রন্টের শ্রমমন্ত্রী ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) নেতা সুবোধ ব্যানার্জী। তিনি মন্ত্রী হয়ে দলের নীতি অনুযায়ী ঘোষণা করেছিলেন, ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। এর ফলে এত দিন শ্রমজীবী মানুষের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনগুলি যে পুলিশি দমন-পীড়নের নির্মম শিকার হয়ে এসেছে তা বন্ধ হল। রাজ্য জুড়ে শ্রমিকদের উপর দীর্ঘদিনের বঞ্চনার প্রতিবাদে আন্দোলনের জোয়ার উঠল। মালিকমহলে উঠল গেল গেল রব। তারা তারস্বরে প্রচার চালাতে থাকল যে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। তাদের পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিও তাদের কথা ফলাও করে ছাপতে থাকল। মালিকদের এই প্রচারে কোনও কোনও শ্রমিক সংগঠনের নেতারাও বিভ্রান্ত হলেন। একমাত্র শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র নেতারা এই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশের মানুষকে বললেন, এটা মালিকদের পরিকল্পিত মিথ্যা প্রচার। কারখানা বন্ধ করছে মালিকরাই এবং তা হচ্ছে উৎপাদিত পণ্যের বাজার অর্থাৎ দেশের মানুষের কেনার ক্ষমতা না থাকার কারণে। কেন্দ্রীয় সরকারের মাশুল সমীকরণ নীতিও এ রাজ্যের শিল্পকে দুর্বল করার অন্যতম কারণ হিসাবে সে দিন কাজ করেছিল। রাজ্য সরকারের তৎকালীন শ্রমকমিশনার দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় কতগুলি কারখানা মালিকরা বন্ধ করেছে, আর কতগুলি কারখানা শ্রমিক আন্দোলনের জন্য বন্ধ হয়েছে, তার তথ্য দিয়ে দেখান যে, শ্রমিক আন্দোলনের জন্য কারখানা বন্ধ হয় না, বন্ধ হয় বাজার না থাকার কারণে, মালিকদের কাছে উৎপাদন লাভজনক না হওয়ার কারণে।

এক দিকে সরকারের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী চরিত্র, অন্য দিকে বেশির ভাগ শ্রমিক সংগঠনের আপসকামী চরিত্রের কারণে শ্রমিকদের উপর ভয়ঙ্কর মালিকী শোষণ-নিপীড়ন সত্ত্বেও দেশে তেমন উল্লেখযোগ্য শ্রমিক আন্দোলনই গড়ে উঠছে না। ছোট এবং মাঝারি শিল্প-কলকারখানায় শ্রমিকদের ইউনিয়ন নেই বললেই চলে। বড় কারখানাগুলিতেও খুব অল্প সংখ্যক শ্রমিকই ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। এই অবস্থায় বিচারপতি শ্রমিক আন্দোলনের কারণে কারখানা বন্ধ হওয়ার যে কথা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ অসত্য এবং গত বহু দশক ধরে মালিকদের প্রচারিত একটি অসত্যের চর্বিতচর্বণ।

বিশ্বজোড়া মালিকদের চরিত্র একই— শোষণের চরিত্র। তাই শুধু ভারতে নয়, গোটা বিশ্ব জুড়েই শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পাওনার দাবিতে আন্দোলন করছে। বনেদি পুঁজিবাদী দেশ বলে পরিচিত যে ইউরোপের দেশগুলি সেখানে শ্রমিক আন্দোলনের ঝড় বইছে। বিচারপতির এ সব কথা না জানার কোনও কারণ নেই। তবুও তিনি এ সব কথা বললেন কেন?

জেনে কিংবা না জেনে, তা বড় কথা নয়, প্রধান বিচারপতি বাস্তবে মালিক শ্রেণির ভাষাতেই কথা বলেছেন। তাঁর কথাতে মালিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি তাঁর কথার দ্বারা আবার প্রমাণ করলেন, একজন বিচারপতিও শ্রেণি-রাজনীতির ঊর্ধ্বে নন— সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হলেও। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণি-নিরপেক্ষতার কোনও জায়গা নেই। রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে পুলিশ-প্রশাসন, আমলাতন্ত্রে এবং মিলিটারির সঙ্গে যে বিচারব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা হয়, তা কতখানি সত্য তা তাঁর কথা থেকেই বেরিয়ে এল। যারা ভাবেন, রাষ্ট্র মানে সবার রাষ্ট্র, তাঁরা নিশ্চয় প্রধান বিচারপতির কথা থেকে শিক্ষা নেবেন। তা যদি সত্য হত, যদি এই রাষ্ট্র মালিক এবং শ্রমিক, শোষক এবং শোষিত সবার হত, তবে বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে থাকা ব্যক্তি মালিক শ্রেণির পক্ষ নিয়ে শ্রমিকদের বাঁচার লড়াইকে এ ভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেন না।

বহু আগেই সর্বহারা শ্রেণির মুক্তিপথের দিশারি মহান মার্ক্স দেখিয়ে গেছেন, রাষ্ট্র মানেই শ্রেণি রাষ্ট্র। দেখিয়েছেন, রাষ্ট্র হল এক শ্রেণির হাতে অপর শ্রেণিকে দমনের যন্ত্র। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হল পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে শ্রমিক শ্রেণি তথা মেহনতি মানুষের উপর দমন চালানোর যন্ত্র। স্বাভাবিক ভাবেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পার্লামেন্ট, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা সব কিছুকেই মালিক শ্রেণির শাসন এবং শোষণের হাতিয়ার হিসাবেই গড়ে তোলা হয়। কিন্তু তারা মুখে এ কথা স্বীকার করে না। তারা একে গণতান্ত্রিক তথা সবার রাষ্ট্র হিসাবে দেখাতে চায়। বাস্তবে এই রাষ্ট্রে গণতন্ত্র যা কিছু আছে তা মালিক শ্রেণির জন্য অবাধ শ্রমিক শোষণের গণতন্ত্র। শোষিত মানুষের জন্য গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও থাকে না। শ্রমিক শ্রেণি, শোষিত শ্রেণি তথা ৯৯ ভাগ মানুষ গণতন্ত্রের সুযোগ পায় একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, যা আসলে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র।

উল্লেখ্য, প্রধান বিচারপতি গৃহসহায়কদের ন্যূনতম বেতনের অধিকারকে তাঁর রায়ে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছেন।

নাজিরাবাদে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের দায় সরকার ও শাসক দলেরই

আনন্দপুর বাইপাসের নাজিরাবাদে ২৬ জানুয়ারি রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৮ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

‘ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে ৮ জন মৃতের দেহাংশ উদ্ধার ও এখনও পর্যন্ত ২৩ জনের নিখোঁজের ঘটনায় রাজ্যবাসী স্তম্ভিত। সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিখোঁজ ব্যক্তিদের মৃত্যুর আশঙ্কাই স্পষ্ট হচ্ছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, অবৈধ ব্যবসায়িক স্বার্থে শাসকদল ও প্রশাসনকে ‘খুশি করে’ ধারাবাহিক ভাবে আইন ও নিয়ম লঙ্ঘন করা যায়। জলাভূমি বোজানো, ফায়ার অডিট না করা ও অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা না রাখার বেনিয়মগুলি আবারও সামনে আসছে। এমন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রায় নিয়মিত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বহু দিন ধরে বেনিয়ম চলার পর যখন এতগুলি অসহায় জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন সরকার ও প্রশাসন নিয়মানুগ এফআইআর, তদন্ত এবং ক্ষতিপূরণের কথা শোনাচ্ছে যা দায় এড়ানোর নিষ্ঠুর প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। শহরের সাম্প্রতিক অতীতের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডগুলিতে যত বার সম্পত্তিহানি ও গণমৃত্যু ঘটেছে, এমনই সরকারি প্রহসনের সাক্ষী আমরা থেকেছি।’

তিনি বলেন, ‘আমরা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিচারবিভাগীয় তদন্ত, যারা বেআইনি ভাবে ওই গোডাউন চালাতে দিয়েছে সেই প্রশাসনিক ব্যক্তি সহ সকল দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচার, অসহায় মৃত ও নিখোঁজদের পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ এবং ভবিষ্যতে এমন ভয়াবহ ঘটনা যাতে রাজ্যে না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।’

অগ্নিকাণ্ড ঃ দলের বিক্ষোভ

নরেন্দ্রপুর ঃ নাজিরাবাদের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জনের বেশি শ্রমিকের অকালমৃত্যুর প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি দলের সোনারপুর, গড়িয়া এবং রাজপুর-হরিনাভি ইউনিটের পক্ষ থেকে নরেন্দ্রপুর থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

নেতৃত্ব দেন কমরেড মিহির রায়, কমরেড মিনতি মিত্র, কমরেড চয়নিকা হাতি। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, নিহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকে নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

তমলুক ঃ এই অগ্নিকাণ্ডে জেলার তমলুক-ময়না-নন্দকুমার-পাঁশকুড়া-শহিদ মাতঙ্গিনী প্রভৃতি ব্লকের যে শ্রমিকরা ওই দুটি সংস্থায় কাজ করতেন তাদের অনেকের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমস্ত নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের উপযুক্ত চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া, নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট সংগ্রহ করে বিষয়টির দ্রুত সমাধান ইত্যাদি দাবিতে ৩০ জানুয়ারি দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসক দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন দলের উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক প্রণব মাইতি, জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, জেলা কমিটির সদস্য প্রবীর প্রধান ও স্বপন বেরা, বিশ্বজিত নায়েক প্রমুখ।

নাজিরাবাদ ঃ ঘটনাস্থলে সিপিডিআরএস প্রতিনিধিরা

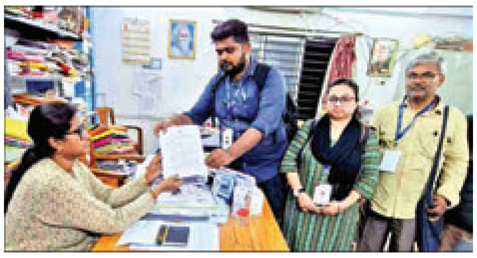

নাজিরাবাদে বেসরকারি সংস্থার গুদামে ২৬ জানুয়ারি রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর প্রতিনিধিদল ২৯ জানুয়ারি ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান। তাঁরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করে তথ্য সংগ্রহ করেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত সহায়তা প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর সুজয় দাস, পুলক দে, ডঃ রেশমা সিং এবং নির্মল ঘোষের নেতৃত্বে চার সদস্যের সিপিডিআরএস ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের পক্ষ থেকে নরেন্দ্রপুর থানায় পুলিশ আধিকারিককে দাবিপত্র দেওয়া হয়।

অবশেষে উদ্বোধন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের

অবশেষে ২৮ জানুয়ারি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী প্রকল্প ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান-এর ভার্চুয়াল উদ্বোধন হল হুগলির সিঙ্গুরে। এ প্রসঙ্গে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি প্রকল্পের কাজের গতি ত্বরান্বিত করে দ্রুত নদী সংস্কারের কাজ শেষ করার দাবি জানান। কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়— দুই মেদিনীপুর জেলার ১৩টি ব্লকের কুড়ি লক্ষেরও বেশি মানুষকে ফি বছরের বন্যার হাত থেকে মুক্তি দিতে এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফল এই মাস্টার প্ল্যান।

নাজিরাবাদ অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিকমৃত্যুর প্রতিবাদে এআইইউটিইউসি-র বিক্ষোভ

নরেন্দ্রপুর থানায় নাজিরাবাদের গুদামে আগুনে পুড়ে কমপক্ষে ২৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু ও বহু শ্রমিকের নিখোঁজ থাকার মর্মান্তিক ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং মৃতদের পরিবারগুলিকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, একজনকে চাকরি এবং আহতদের ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, কোনও শ্রমিককে উপযুক্ত নিরাপত্তা ছাড়া কাজ না করানো সহ ৪ দফা দাবিতে ২৯ জানুয়ারি কলকাতার ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির পাদদেশে এআইইউটিইউসি বিক্ষোভ দেখায়। শতাধিক শ্রমিকের বিক্ষোভ মিছিল সরকারকে ধিক্কার জানায়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। মিছিলে অংশ নেন সহসভাপতি কমরেড শান্তি ঘোষ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনিন্দ্য রায়চৌধুরী, কমরেড জয়ন্ত সাহা, কমরেড তপন মুখার্জি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ও নেতৃবৃন্দ

মিছিল শেষে কমরেড অশোক দাস ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জৈমিনী বর্মন রাজভবনে গিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে আলোচনা করেন। অবিলম্বে দাবিগুলো না মানলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। পুলিশের মাধ্যমে স্মারকলিপি পাঠানো হয় মুখ্যমন্ত্রীকে।

৩০ জানুয়ারি সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস, সহসভাপতি কমরেড নন্দ পাত্র, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শ্যামল রাম ও কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সজল দাসের এক প্রতিনিধিদল নাজিরাবাদের অগ্নিদগ্ধ গুদাম এলাকা পরিদর্শনে যান। তাঁরা এলাকার মানুষের সাথে কথা বলেন। প্রকৃত সত্য জানার প্রয়োজনে প্রতিনিধিরা অগ্নিদগ্ধ গুদামে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয় এবং তাঁদের সঙ্গে পুলিশের প্রবল বাদানুবাদ হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ রাজ্য সম্পাদককে ভিতরে ঢুকতে দিতে বাধ্য হয়। উপস্থিত সাংবাদিকদের কমরেড অশোক দাস বলেন, শাসক দল ও প্রশাসনের একাংশের যোগসাজসে মুনাফালোভী মোমো ও ডেকোরেটর মালিকদের শ্রম আইনবিরুদ্ধ ও অমানবিক গাফিলতিই এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য মূলত দায়ী। গুদামে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা ছিল না শুধু তাই নয়, অভিযোগ— বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল। তালা দেওয়া না থাকলে এই ভাবে এতজন শ্রমিককে পুড়ে মরতে হত না। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কে তালা লাগিয়েছিল ও চাবি কার কাছে ছিল? তিনি আরও বলেন, উপযুক্ত নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা না রেখে কী ভাবে জলাজমিতে এই ধরনের বেআইনি গুদাম নির্মাণে প্রশাসনিক ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল? তিনি দাবি করেন, নিরপেক্ষ তদন্ত করে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এখনও কেন ওয়াও মোমোর মালিকদের গ্রেপ্তার না করে স্টাফদের গ্রেফতার করা হয়েছে? এর মধ্যে অন্য কোনও ষড়যন্ত্র নেই তো? অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত করে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া না গেলে এবং ৪ দফা দাবি মেনে নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে তিনি জানান।

কোচবিহারে এআইইউটিইউসি-র প্রতিবাদ মিছিল ও শোকসভা ঃ ২৯ জানুয়ারি কোচবিহার শহরে শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে এক শোকসভা ও প্রতিবাদ মিছিল হয়। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে নিহত শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড নেপাল মিত্র, জেলা সহ সভাপতি কমরেড বিপুল ঘোষ সহ অন্যান্য জেলা স্তরের শ্রমিক নেতৃত্ব।

এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে মালদায় গণস্বাক্ষর অভিযান

বেকারত্ব, চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে ৫ মার্চ রাজ্যপালের কাছে স্বাক্ষর সহ দাবিপত্র পেশ করতে চলেছে যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও। এই উপলক্ষে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর শহিদ মোড়ে গণস্বাক্ষর অভিযান হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক মাইতি, মালদা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সুভাষ সরকার এবং সভাপতি উজ্জ্বলেন্দু সরকার, জেলা কোষাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ সাহা, সদস্য কেশব সরকার প্রমুখ।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 26 Bengali Weekly February 6, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

‘আপনাদের লড়াইয়ের পাশে আছি’ ঃ আশাকর্মীদের আন্দোলনের সমর্থনে ঘোষণা নাগরিক সমাজের

আশাকর্মী এবং পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের ন্যায্য দাবির প্রতি দীর্ঘ সরকারি অবহেলার প্রতিবাদে কলকাতা প্রেসক্লাবের লনে নাগরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৩০ জানুয়ারি। এ দিন ছিল আশাকর্মীদের কর্মবিরতির ৩৯তম দিন। সম্মেলন পরিচালনা করেন নার্সেস ইউনিটির সম্পাদিকা ভাস্বতী মুখার্জী ও মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক সৌম্য সেন। নাজিরাবাদে অগ্নিকাণ্ডে নিহত শ্রমিকদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে নাগরিক সম্মেলন শুরু হয়। অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার বলেন, আশাকর্মীরা স্বাস্থ্য পরিষেবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। সরকার এদের দিয়ে কাজ করায় অথচ সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দেয় না। এ অত্যন্ত অন্যায়। এঁদের আন্দোলনের পাশে অবশ্যই থাকব।

আর জি কর আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ডাঃ অনিকেত মাহাতো বলেন, কোভিডের সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আশাকর্মীরা স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে গেছেন। সরকারি অবহেলায় যখন গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি ধুঁকছে, তখন আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগীদের খোঁজ করা, হাসপাতালমুখী করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাঁদের লড়াইকে সমর্থন করে তিনি বলেন, এ আন্দোলন শুধু আশাকর্মীদের নয়, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা টিকিয়ে রাখার আন্দোলন।

বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ অনিতা রায় বলেন, মাসিক পাঁচ হাজার টাকায় সংসার চলা সম্ভব? কী সাংঘাতিক শোষণ! আমরা সকলেই আপনাদের পাশে আছি।

বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী তাঁর বার্তায় বলেন, আশাকর্মীরা স্বাস্থ্য পরিষেবার শিরদাঁড়া। তাঁদের ন্যায্য দাবি সরকার মেনে নিক। আমার কণ্ঠ সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবে। গায়ক পল্লব কীর্তনীয়া তাঁর বার্তায় বলেন, এই আন্দোলনের পাশে আছি।

অধ্যাপিকা শাশ্বতী ঘোষ বলেন, কেরালা হোক বা পশ্চিমবঙ্গ— কোনও সরকারই আশাকর্মীদের দাবিগুলি মানতে চাইছে না। আপনাদের আন্দোলন নাগরিকদের চোখ খুলে দিয়েছে। আপনারা জয়ী হওয়া মানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জয়, নাগরিকদের জয়। বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শুভেন্দু মাইতি বলেন, আশাকর্মীদের চিৎকার যাতে আরও উচ্চকণ্ঠ হয় তাই এসেছি। এই চিৎকারে সামিল হতে বলব সকলকেই। অধ্যাপক অশোক সরকার বলেন, স্বাস্থ্য সূচক যে কিছুটা উন্নত হয়েছে, তা আশাদের কল্যাণে। সরকারের অবশ্যই উচিত এঁদের স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি দেওয়া। চিকিৎসক আন্দোলনের নেতা ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র বলেন, ২৪ ঘণ্টাই আশাকর্মীদের ডিউটির জন্য রেডি থাকতে হয়। এই শ্রমের মূল্য সরকার দেবে না কেন? আন্তর্জাতিক নানা মঞ্চেস্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য সরকার প্রশংসিত হচ্ছে আশাকর্মীদের শ্রমের বিনিময়ে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের দাবি মানেন না, এটা চরম লজ্জার। শহরে আশা প্রকল্পের কাজ করেন পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাঁদের পক্ষে পৌর স্বাস্থ্যকর্মী কর্মী কন্ট্রাকচুয়াল ইউনিয়নের যুগ্মসম্পাদিকা কেকা পাল বলেন, ২১ জানুয়ারি ভোর সাড়ে পাঁচটায় দুজন পুরুষ পুলিশ আমাকে আটকাল। টেনে তুলল ভ্যানে। বললাম, আমি স্বাস্থ্যকর্মী, আমাকে আমার কাজে যেতে দিন। ওরা থানায় নিয়ে আমাকে একটা অন্ধকার ঘরে আটকে রাখল ছ'ঘণ্টা। ফোন কেড়ে নিল। ফোন থেকে ভুয়ো মেসেজ কল করল শিলিগুড়ি গ্রুপে যে, কর্মসূচি বাতিল হয়ে গেছে। তোমার এসো না। এখন হুমকি দেওয়া হচ্ছে, কাজে যোগ দাও। না হলে তোমাদের জায়গায় অন্য লোক নেব। কিন্তু

আশাকর্মীদের সমর্থনে কলকাতা প্রেস ক্লাবের লনে নাগরিক সম্মেলনে বিশিষ্টজনেরা। ৩০ জানুয়ারি

হুমকির সামনে আমরা মাথা নত করব না। নাগরিকরা পাশে আসায় আমরা আরও উদ্দীপ্ত। আমাদের আন্দোলন বন্ধহবে না।

কয়েক মাস আগে ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের ব্যাপক অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ছাত্রী সুশ্রীতা সরেন। তিনি আশাকর্মী আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ আপনাদের আন্দোলনের পাশে আছে। আইনজীবী দেবযানী সেনগুপ্ত বলেন, কাজ অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাওয়া মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। এই অধিকারটুকুও থাকবে না! সরকার স্বাস্থ্য ভবনে আন্দোলনকারীদের ডেকে পাঠিয়ে পুলিশ দিয়ে রাস্তায় আটকাল! এই স্বৈরাচার চলতে পারে না।

প্রাক্তন অধ্যক্ষা মৈত্রেয়ী বর্ধন রায় আশাকর্মীদের আন্দোলনে পুলিশি হামলা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা কি সত্যিই সভ্য সমাজে বেঁচে আছি! এটা কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র! আপনাদের কোনও দাবি অন্যায্য নয়। আমি আপনাদের পাশে আছি। সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সভাপতি ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী বলেন, আশাকর্মীদের ভাতা বাড়ালে মাত্র ৮২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে সরকারকে। এটুকু সরকার বরাদ্দ করতে পারে না! শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পক্ষ থেকে সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী আশাকর্মীদের আন্দোলনকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রাক্তন বিচারপতি অনন্ত বর্ধন বলেন, যা দেখেছি, যা শুনলাম, তাতে বলা উচিত, আন্দোলন আরও জোরদার করুন। আমরা পাশে আছি। অধ্যাপক মনোজ গুহ বলেন, আপনারা গণআন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করেছেন। গোটা রাজ্য জুড়ে বেগুনি ঝড় তুলেছেন আপনারা। এগিয়ে যান। আপনাদের সাথে আমরা আছি।

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন বলেন, নাগরিকরা যে বক্তব্য রাখলেন তাতে আমরা অনুপ্রাণিত। ভারতে নানা প্রকল্পে কয়েক কোটি মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত। কিন্তু শ্রমের মূল্য দাবি করলেই, সম কাজে সম মজুরি দাবি করলেই সরকার এড়িয়ে যায়। মা ও শিশুর সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত যে আশাকর্মীরা, তাঁদের ন্যূনতম মজুরি দিতে হবে, এটা আমাদের দাবি। এ দাবি কি অন্যায়, বেআইনি? আমরা লক্ষ রাখছি, আসন্ন বাজেটে এই দাবির প্রতি যদি সুবিচার করা না হয়,আন্দোলন নতুন মোড় নেবে।

কালা ৪টি শ্রম কোড বাতিল,
মূল্যবৃদ্ধি ও বেসরকারিকরণ রোধ,
১০০ দিনের কাজের প্রকল্প পূর্বের মত চালু সহ
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী
নীতি ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে

১২ ফেব্রুয়ারি'২৬
যুক্ত ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে
সারা ভারত সাধারণ
ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে

রাজ্যে শিল্প ধর্মঘট
সফল করুন

AIUTUC

প্রধান বিচারপতির মন্তব্য শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী

এ আই ইউ টি ইউ সি

কারখানা বন্ধের জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে দায়ী করে ভারতের প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাশগুপ্ত ৩১ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

২৯ জানুয়ারি একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিকালে প্রধান বিচারপতির এই মন্তব্য স্পষ্টতই একচেটিয়া পুঁজি-মালিকদের নির্দেশে পরিচালিত সরকারি মনোভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। একজন প্রধান বিচারপতির পদমর্যাদার সাথে এটা বেমানান। ভারতের মতো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বিচারবিভাগের চরিত্র যে মালিক শ্রেণিরই স্বার্থবাহী, সেটাই স্পষ্ট করে এ হেন মন্তব্য। আমাদের দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে শ্রমজীবী জনগণকে এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত তথ্যের সাথেও প্রধান বিচারপতির মন্তব্য সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ভারত সরকারের তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গত ৫ বছরে মালিক ও শ্রমিকের বিরোধের সংখ্যা একশোরও কম, যেখানে একই সময়ে মালিকদের কারণে কারখানা বন্ধের সংখ্যা ৪০ হাজারেরও বেশি। প্রধান বিচারপতি আরও বলেছেন যে, পরিচারিকাদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের কোনও প্রয়োজন নেই, যদিও কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যেই এটি নির্ধারণ করেছে এবং এটি একটি ন্যায়সঙ্গত বিষয় যা কেন্দ্রীয় সরকার বছরের পর বছর ধরে অস্বীকার করে আসছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধান বিচারপতির বক্তব্য পরিচারিকাদের প্রতি নিতান্তই অপমানজনক।

শ্রমিকবিরোধী, জনবিরোধী এবং একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থবাহী ৪টি শ্রম কোড বাতিল করে বহু সংগ্রামে অর্জিত ২৯টি শ্রম আইন পুনরায় চালুর দাবিতে এআইইউটিইউসি সহ ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের যুক্তমঞ্চ ১২ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। প্রধান বিচারপতির এই মন্তব্য স্পষ্টতই কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ন্যায়সঙ্গত ধর্মঘটের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতাকে সমর্থন করে।

আমরা দেশের শ্রমজীবী মানুষ এবং সাধারণ জনগণকে আবেদন করছি, প্রধান বিচারপতির এ হেন শ্রমিকবিরোধী, ট্রেড ইউনিয়নবিরোধী, সরকারপন্থী এবং মালিকি স্বার্থবাহী মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করুন এবং ১২ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে সম্পূর্ণ সফল করার জন্য প্রস্তুতি জোরদার করুন।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com